নজরুলের নাটকে লোক-উপাদানের ব্যবহার

শারমিন মুস্তারী*

[সারসংক্ষেপ : কিশোর বয়সে লেটো দলের জন্য পালা রচনার মধ্য দিয়ে নজরুলের নাট্যচর্চা শুরু। কাজী নজরুল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা খুব কম। তাঁর বেশিরভাগ নাট্যকর্মই নাটিকা, গীতিনাট্য, বেতারনাট্য ও রেকর্ডনাট্য। নজরুলের সাহিত্যকর্মের মধ্যে নাটক অনেকটা উপেক্ষিত। অথচ নাটকের মাধ্যমে তাঁর প্রতিভার বিশেষ দিক গীতিপ্রবণতা ও লোক-ঐতিহ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ পরিলক্ষিত হয়। তিনি মূলত গীতিকবি ও গীতিকার। নাটক রচনায় তাঁর সযত্ন প্রয়াস ছিল, বলা যায় না। তাঁর নাটক শৈল্পিক মানদণ্ডে সবক্ষেত্রে উত্তীর্ণ না হলেও লোকজীবন ও ঐতিহ্যের প্রতি তিনি যে সম্মান দেখিয়েছেন এবং নাটকে স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, তা-ই তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।]

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) পরিচয় প্রধানত কবি এবং সুরস্রষ্টা হিসেবে। তবে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নাটক– সাহিত্যের এসব শাখাতেও তাঁর সাবলীল বিচরণ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিক হতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিক পর্যন্ত হলো নজরুলের সাহিত্যজীবন। যুদ্ধোত্তর দুঃখবাদ, নৈরাশ্যবাদ, মৃত্যুচেতনা প্রভৃতি মৌল বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে কাজী নজরুল তাঁর রচনায় নিয়ে আসেন উজ্জ্বল আশাবাদ।

কিশোর বয়সে গ্রাম্য যাত্রাদলের সংস্পর্শে এসে গীতিনাট্য রচনার মধ্য দিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। বাংলার অন্যতম প্রধান লোকনাট্য-আঙ্গিক 'লেটোর' দলের জন্য পদ্যে নাটক রচনা করে বা পালা রচনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল নজরুলের নাট্য-প্রতিভার বিকাশ। বাংলা নাটকের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) সামসময়িক নাট্যরচনায় স্বকীয় অবস্থান তৈরি করেছিলেন স্বীয় প্রতিভায়। নজরুল সে-সময় রবীন্দ্র-প্রভাবকে উপেক্ষা করে নাটকের বিষয় ও শিল্পচারিত্র্যে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। নজরুল ছিলেন আপাদমস্তক একজন নাট্যপ্রেমী। তাঁর সাহিত্যকর্মের পরিধির একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে নাটক, নাটিকা, নাট্যধর্মী রচনা, রেকর্ড নাট্যসহ বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনা। এসব নাট্যকর্ম ব্যাপক পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণার দাবি রাখে। অনুপম হায়াৎ কাজী নজরুল ইসলামের মোট ৮০টি নাট্যকর্মের তালিকা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য :

> নজরুল প্রতিভা যেমন অনন্য সাধারণ তেমন অপরিমেয়। প্রতিকূল পরিবেশের শিকার হয়েও নজরুল তাঁর সৃষ্টি কাজ অব্যাহত রেখেছেন। সেই সৃষ্টির এক সরব ক্ষেত্র ছিল নাটক। নজরুলের নাট্যজীবন, নাট্যকর্ম, নাট্যচর্চা, নাট্যভাবনা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর নাট্য সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত তথ্য ও নিদর্শন এখনো রয়ে গেছে অনুদ্ধারিত। এ পর্যন্ত তাঁর নিজের লেখা নাটক ও নাট্যধর্মী রচনার মধ্যে প্রায় ৮০টির নাম পাওয়া গেছে, আর তাঁর গান লেখা ও সুর সংযোজিত অন্যের লেখা নাটকের সংখ্যা পাওয়া গেছে ৫০টির মতো। এসব সংখ্যার মধ্যে নজরুলের পূর্ণাঙ্গ নাট্য জীবনের পরিচয় না পাওয়া গেলেও তাঁর প্রতিভা ও সৃষ্টির অবদানে বাংলা নাটক হয়েছে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় এ কথা নিঃসন্দেহে বলা হয়। (অনুপম, ১৯৯৭ : ৪৮)

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

কাজী নজরুল ইসলামের চাচা ফজলে করিম ছিলেন স্থানীয় লেটো দলের ওস্তাদ। তার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় নজরুল লেটোদলে যোগ দিয়ে খুব দ্রুত খ্যাতি অর্জন করেন। মাত্র ১১/১২ বছর বয়সে তিনি লেটোদলের জন্য অনেকগুলো পালা রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে 'শকুনিবধ', 'মেঘনাদবধ', 'রাজপুত্র', 'চাষার সঙ', 'বিদ্যাভূতুম', 'কবি কালিদাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই লেটোদলকে কেন্দ্র করেই নজরুলের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাঁর নাট্যচর্চার সূত্রপাতও এই লেটোদলকে কেন্দ্র করে। নাচ-গান-অভিনয় সমৃদ্ধ লেটোগান রচনার মধ্যদিয়ে একদিকে তিনি বাংলার লোকনাট্য ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন; আবার পরিণত বয়সেও তিনি এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখেন।

'সংস্কৃতির প্রধান বাহনটির নাম লোকসংস্কৃতি' (মাহবুব, ২০০১ : ৯১)। লোকসংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানই হলো লোক-উপাদান। এসব উপাদানের ব্যবহার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে যেমন দেখা যায়, তেমনি আধুনিক সাহিত্যেও এর ব্যবহার রয়েছে। বলতে গেলে উত্তরাধুনিক সাহিত্যের মর্মমূল পর্যন্ত গ্রথিত লোক-উপাদান।

নজরুল বৃহত্তর লোকজীবনের অনেক অনুষঙ্গ-উপাদান-উপকরণ ব্যবহার করেছেন তাঁর গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে এবং নাটকে। এর কারণ নজরুল লোকজীবনের কবি। বৃহত্তর গণমানুষের পক্ষে আজীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন। একদিকে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক অন্যায়-অবিচার, রাষ্ট্রের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছেন, অন্যদিকে বৃহত্তর লোক-জীবন থেকে উপাদান নিয়ে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

নজরুলের বাল্য ও কৈশোর জীবনজুড়ে আছে গ্রামীণ জীবনের নানা অনুষঙ্গ। তিনি মক্তবে পড়েছেন, সেখানে পড়িয়েছেন। লেটোদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্ধমান অঞ্চলের লোক জীবনের সবটাই তাঁর মনে গাঁথা ছিল সেই ছেলেবেলা থেকে। লোকজীবনের প্রভাব তাঁর সাহিত্যে তাই অনেকটা স্বাভাবিকভাবে গ্রথিত হয়েছে। নজরুলের নাট্য-প্রতিভার প্রকাশ শুরু আবহমান বাংলার লেটোগান রচনার মধ্যদিয়ে। সে হিসেবে বলা যায় নজরুল নাটকের জগতে পা দেন লোকনাটকের অভিজ্ঞতা নিয়ে। বাংলার আবহমানকালের গীতিবহুল লোকযাত্রার রূপকল্পকে কাজে লাগিয়ে নজরুল নতুন ধারার নাট্যরচনায় হাত দেন। লোকনাটকের আঙ্গিক নিয়ে সমালোচকের অভিমত এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় :

> আমাদের নাট্যসাহিত্যকে অভিনয়রীতি এবং আনুষঙ্গিক ভিত্তি অনুযায়ী দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি গ্রামীণ যাত্রারীতি, অপরটি প্রচলিত নাটকরীতি। যাত্রা, লোক ভাষায় রচিত এবং বিশেষ লোকনাট্যের ঢং-এ গ্রাম্য সমাজের উপযোগী আসরে গীত বা অভিনীত হয়। যাত্রার জন্য কোন ব্যয়বহুল রঙ্গমঞ্চ, সাজসরঞ্জাম, বা আর্থিক আয়োজনের তেমন প্রয়োজন হয় না। গান এবং অভিনয় কৌশলই যাত্রার প্রধান উপকরণ। আমাদের গ্রাম্য-সমাজের আনন্দোৎসবে নৃত্য, গীতবাদ্যের আবেদন অধিক হওয়ায়, যাত্রা নাটকের রূপায়ণ, রীতিতেও গীতিবাদ্যের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। যাত্রার প্রাথমিক রূপই গীতিনাট্য বা গীতিবহুল নাটক। (আরিফুল, ১৯৯৯ : ৪৩)

লেটোগান রচনার মধ্যদিয়ে নজরুলের নাট্যচর্চার হাতেখড়ি। লেটোগান বর্ধমান অঞ্চলের গান-নাচ-অভিনয়ের একটি মিশ্রধারা। গ্রামীণ-জীবনের অনেক বিষয় নজরুলের মনোজগতে প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর নাট্যরচনায় সে-সবের ছায়া রয়েছে। গ্রামের সাধারণ মানুষের চলমান জীবনে যে সংস্কৃতি বহমান তা-ই লোক-ঐতিহ্য। তারা পুরুষানুক্রমে অনেক কিছু অনুকরণ-অনুসরণ-

অনুধাবন করে যার কার্যকারণ সম্পর্ক যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা চলে না। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নজরুলের নাটকেও লোক ঐতিহ্য ও লোক-উপাদান বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। তাঁর নাটকে লোক-অনুষঙ্গের মধ্যে রয়েছে : ১. গ্রামীণ জীবনের বর্ণনা, ২. লোকসংস্কার, ৩. লোকবিশ্বাস, ৪. লোকগান, ৫. ছড়া।

নজরুল তাঁর নাট্যসম্ভারে লোকজ উপাদানের প্রতি অকৃত্রিম দরদ দেখিয়েছেন। লোকবিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস, লোকসংস্কার, আচার-প্রথা, পার্বণ-সংক্রান্ত গ্রামীণ-চেতনা নজরুল-রচনায় নানাভাবে মিশে আছে। অন্তরীক্ষে জিন-পরী অপ্সরা, মর্ত্যে ভূত-প্রেত, আলেয়া, রাক্ষস-খোক্ষস, পানিতে জলদানো ইত্যাদি অলৌকিক অশরীরী আত্মা সম্পর্কে বিশ্বাস-সংস্কারের চিত্র রয়েছে নজরুলের নাটকে। গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের কারণে নজরুলের নাটকে লোক-সংস্কৃতির বিষয়টি সহজ-সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে। গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনে দীর্ঘদিন লালিত লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার চমৎকার অনুষঙ্গ হয়েছে তাঁর নাটকে।

সাপ নিয়ে লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার বাংলাদেশে অতি পরিচিত। বেদেরা ভূত-প্রেত, জাদু-টোনা, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবচ প্রভৃতি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে থাকে। বেদে সম্প্রদায় ও তাদের জীবনাচরণ নিয়ে রয়েছে 'বনের বেদে' নাটিকা। নজরুল বেদের জীবন সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেই তাদের নিয়ে নাটক লিখেছেন। তিনি তাদের ঝাপান গানের সুর ও রাগ অনুসারে গান রচনা করেছেন। এ ধরনের একটি গান :

নিম ফুলের মৌ পিয়ে ঝিম হয়েছে ভোমরা
মিটে হাসির নূপুর বাজাও ঝুমুর নাচো তোমরা।
(নজরুল, ২০০৮ : ৩২৫)

লোক-বিশ্বাসের চিত্র রয়েছে 'বিলাতী ঘোড়ার বাচ্চা' নাটিকায়। কিরা কাটা, কসম কাটা, ভূতে বিশ্বাস– এগুলো লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত। নাটকটিতে লটারি জেতার কাল্পনিক টাকা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, এক পর্যায়ে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রহার- সমস্ত ঘটনার পর স্ত্রীটির বিশ্বাস জন্মেছে যে তার স্বামীকে বিলাতী ঘোড়ার ভূতে পেয়েছে। নাটিকাটির আর এক জায়গায় স্ত্রী প্রতিজ্ঞা করে এভাবে :

আমি যদি এক বাপের বিটি হই, তবে আমার
গয়না আগে হইব। তারপর অন্য কিছু।
(নজরুল, ২০০৮ : ২২৪)

রূপকথা গ্রামাঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়। গ্রামীণ জীবনে দেখা যায়, অবসর সময়ে নানী, দাদী, চাচী, ফুফুদের কাছে শিশু-কিশোররা রূপকথা শুনতে চায়। জিন-পরি, দৈত্য-দানব, রাজা-রানীর বাহিনী লোক সংস্কৃতিরই বিশিষ্ট রূপ। 'মধুমালা' নাটকে লোকজীবন রূপায়িত হয়েছে। নাটকটি লোকগাথা-ভিত্তিক। পূর্ববঙ্গ গীতিকা থেকে এর কাহিনি নেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এখানে রাজা-রানি, রাজকন্যা, পেতনি, স্বপ্নপুরী প্রভৃতি রূপকথার নানা অনুষঙ্গ রয়েছে। ময়ূরবাহন, শুকশারি প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। 'মধুমালা'কে লোক-ঐতিহ্যের আধুনিক রূপায়ণ বলা যায়। নজরুল 'মধুমালা'র কাহিনিকে কলকাতার মঞ্চের উপযোগী করে সাজিয়েছিলেন। 'বাংলা সাহিত্যের লোক ঐতিহ্যের বা রূপকথার আধুনিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে 'মধুমালা' একটি বিশিষ্ট সংযোজন'(রফিকুল, ২০০১ : ৪২৬)। 'মধুমালা' নাটকে লোকবিশ্বাসের একটি চিত্র নিম্নরূপ :

অয়স্কান্ত : আজ্ঞে, যদি কাছে শ্যাওড়া গাছ না থাকে, আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারি। এই তিনদিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চোখ-মুখ হয়ে গেছে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতের মত, পেট হয়ে গেছে মাড়োবারের, পা ফুলে হয়ে গেছে উড়িষ্যার, পেটের ভিতর ঝগড়া করছে মাদ্রাজি। আমি একেবারে আন্তর্জাতিক পুরুষ হয়ে পড়েছি। এখন একটু ঘুমুতে না পারলে প্রাণ চলে যাবে চিত্রগুপ্তের দেশে- দেহ নিয়ে টানবে শ্যাওড়া গাছের পেত্নি। (ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন)

রুদ্রকুমার : আচ্ছা বয়স্যদা, পেত্নি নিয়ে যে ঘর করে, তার এত পেত্নির ভয় কেন? তা ছাড়া তোমার শ্বশুরালয়ও ত পেত্নিতলা গ্রামে আর মামার বাড়ি শেওড়া-ফুলিতে। কাজেই শেওড়া গাছ বা পেত্নিকে ত তোমার ভয় করার কথা নয়।

অয়স্কান্ত : তুমি থাম ত হে ছোকরা। তুমি শুধু মানুষ জবাই করতে শিখেছ। মানুষকে পোষ মানানোর গুরুভার কখনো বহন করেছ? বৃষস্কন্ধ পুরুষই নারীকে বয়ে বেড়াতে পারে সংসারে। যুদ্ধে তোমার শোভা যেমন তোমার কোমরের তলোয়ার, তেমনি সংসার যুদ্ধে পুরুষের শোভা তার কাঁধের স্ত্রী, বুঝেছ? (নজরুল, ২০০৮ : ২৭৬)

শুধুমাত্র লোকসাহিত্যের আঙ্গিকেই নাটকটি রচিত নয়। পুরো নাটকে ছড়িয়ে আছে এরকম অসংখ্য লোক-উপাদান, লোক-বিশ্বাসের ছবি।

লোক-উপাদানের আর একটি দিক হলো গ্রামবাংলা তথা গ্রামীণ-জীবনের বর্ণনা। 'কলির কেষ্ট', 'কালোয়াতি কসরৎ' ও 'পুরোনো বলদ নতুন বৌ' নাটিকায় গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনের চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। 'কলির কেষ্ট' নাটিকায় গ্রাম বাংলার উচ্ছৃঙ্খল তরুণদের চিত্র রয়েছে। 'পুরোনো বলদ নতুন বৌ' নাটিকায় গ্রাম বাংলার চিরন্তন দাম্পত্য সম্পর্কের মধুর রূপটি ফুটে উঠেছে। যেখানে রয়েছে মা, ছেলে, ছেলে বৌ। আছে গ্রামবাংলার পিঠা-পুলির প্রসঙ্গ। কাজলা বিল, লজ্জা রাঙা গ্রাম্য বধূ– সব মিলিয়ে চমৎকার গ্রামীণ-পরিবেশ। গ্রামবাংলার পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনের একটি ছবি :

মা ॥ কেডা? বাবা পুঁইটা আইছস? অ গুইলা, গুইলা, ছ্যামড়া গেল কই? আলো বাত্তিডা ধর-

গাড়োয়ান ॥ গুইলা ক্যান? বাড়ির কি আর মানুষ-জন নাই, সব মরছে? সবাইকে দেখবার পাইতেছি, কাউকে দেখবার পাইতেছি না ক্যান?

মা ॥ আচ্ছা বাবা, তুই খাড়া হ, আমিই গিয়া আলো-বাত্তিটা লইয়া আস্‌তেছি।

গাড়োয়ান ॥ তুমি বুড়া মানুষ, তুমিই বা আন্‌বে কিসের লাইগ্যা? বাড়িতে কি আর মানুষ জন নাই, সব মরছে? সবাইরে দেখ্‌ছি মানুষের দেখবার পাইতেছি না যে!

মা ॥ (হাসিয়া) অ, তুই বৌমারে খুঁজত্যাছস্। বৌমা, অ বৌমা, আলো-বাত্তিতা ধর গো, আমাগো পুঁইটা আইত্যাছে। (নজরুল, ২০০৮ : ২৭৭)

'কালোয়াতি কসরৎ'ও গ্রামীণ-জীবন নির্ভর নাটিকা। নজরুল মূলত গীতিকার ও সুর-স্রষ্টা। তাঁর গানে রয়েছে বৈচিত্র্যময় সুর। লোকগান নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। লোকগানের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার দেখা যায় তাঁর নাটকে। 'কালোয়াতি কসরৎ'-এ কালোয়াতি গানের প্রসঙ্গ রয়েছে। যেমন :

গাব্বুসের বাপ : অইগ্যা পেন্নাম ওই পতিতুণ্ডী ঠাউর। আইগ্যা, তুমি আপনি যাইবার লাগছে কই? আহা হাহা! ওদিক পানে যাইওনা ঠাউর! ময়লা আছেন-ময়লা আছেন-মানুষের ময়লা!

পতিতুণ্ডী : কে ও? গাব্বুসের বাপ? হল্লারে বিল্লা। নক্কুরে আইছিল। রামচন্দ্র। বাবা গাব্বুসের বাপ। বাইচা থাহ বাবা কইচা থাহ বাবা। তুমি না কইলে এহনি আমি ঐ ময়লাতে পারা দিচ্ছিলাম। তা

হেরে কি কয়, মুই যাইত্যাচি বৈকুন্টু তলাপাত্রের বাড়িতে। তলাপাত্র বুঝলি? বেডপ্যান, বেড্যান। কলা বুঝছ? হেই তলাপাত্রের বাড়িতে কালোয়াতি গান হইব-হেরে হুনবার যাইতেছি।

গাব্বুসের বাপ : কালো হাতির গান? আইগ্যা কি যে কন। মুইত বাপের জন্মেও কালো হাতির গানও হুনছি না। সার্কসে কালি হাতির নাচ দেখছি-গান ত হুনছি না। মো গো গোরিব গো কি যাইবার দিব?

পতিতুণ্ডী : (হাসিয়া) আরে কালো হাতির গান নয়; কালোয়াতি গান। আইও মোর লগে, যাইবার দিব না কিসের লাইগ্যা। (নজরুল, ২০০৮ : ২৭২)

লোকখেলা, ছড়া লোক-সংস্কৃতির উপাদান। নজরুল লোকখেলা নিয়ে বেশ কয়েকটি শিশুতোষ নাটিকা রচনা করেছেন। 'পুতুল খেলা', 'ছিনিমিনি খেলা', 'কানামাছি', 'কিৎকিৎ খেলা' প্রভৃতি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। 'পুতুলের বিয়ে' নাটকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এখানে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির একটি নিটোল ছবি নজরুল আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

পাঁচটি ছোট ছোট মা তাদের পুতুল ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে কখনো আদর করে ছড়া কাটে, কখনো বিয়ের গান গায়। এই সব ছড়া আর গানের ধ্বনি প্রতিধ্বনি তাদের আঞ্চলিক ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কৃতি ইত্যাদির অনেক টুকরো পরিচয় নাটকটিতে ছড়িয়ে আছে। আঞ্চলিক লোক সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবে এগুলি যথেষ্ট মূল্যবান। (মোতাহেরা, ২০০১ : ৬৬)

'জুজুবুড়ির ভয়'-এ রয়েছে কিৎকিৎ খেলার প্রসঙ্গ। এটিও গ্রামবাংলার অতি পরিচিত লোকখেলা। রয়েছে জুজুবুড়ির প্রসঙ্গ। জুজুবুড়ি এক ধরনের লোকবিশ্বাস। দুষ্ট ছেলেমেয়েদের মা তাদেরকে জুজুবুড়ির ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করে। নাটকের জুজুবুড়ি ছেলে ধরা নয় বরং মা ধরা। এছাড়া এখানে রয়েছে ঘুমপাড়ানি গান। ঘুমপাড়ানি গান লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত। ঘুমপাড়ানি গানটি এরকম :

ঘুম আয় ঘুম। ঘুম আয় ঘুম।
নিশুতি দুপুর, নিশীথ নিঝুম।
ঘুম আয় ঘুম, ঘুম আয় ঘুম!
টুলটুল ঝিঙে ফুল ঘুমে ঝিমায়
ঝুমকো লতায় ঝিঝি আলসে ঘুমায়।
খোকনের চোখে দেয় ঘুম-পরি চুম
ঘুম আয়, ঘুম।
(নজরুল, ২০০৮ : ৩৬৪)

ছিনিমিনি খেলা ও কানামাছি খেলা নিয়ে রয়েছে দুটি নাটক 'ছিনিমিনি খেলা' ও 'কানামাছি'। এসব খেলা এবং এখানে ব্যবহৃত ছড়াগানগুলো লোকজীবনে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কানামাছি খেলায় একজন চোর হয়। তার চোখ বেঁধে দিয়ে চারদিক থেকে তাকে টোকা দেওয়া হয়। চোর চোখ বাঁধা অবস্থায় অন্যদের ধরার চেষ্টা করে আর ছড়া কাটে :

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছোঁ।
(নজরুল, ২০০৮ : ৩৬৭)

খেলায় চোর নির্বাচন করা হয় ছড়া কেটে। ছড়ার শেষ শব্দটি যার দেহ স্পর্শ করে সে-ই চোর হয়। ছড়া লোক-সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। নজরুলের শিশুতোষ নাটিকায় ছড়ার ব্যবহার রয়েছে। ছড়াও শিশুতোষ রচনা। ছড়া আর শিশু অভিন্ন সত্তা। তার নাটকে আর একটি লৌকিক ছড়া :

আইকম, বাইকম তাড়াতাড়ি
যদুমাষ্টার শ্বশুর বাড়ি
রেনকম ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম।
(নজরুল, ২০০৮ : ৩৬৬)

ছড়াটি লোকসমাজে আজও প্রচলিত।

ছিনিমিনিও লোকখেলা। খোলামকুচি ছুঁড়ে এই খেলা খেলতে হয়। এই নাটিকাটিতে লোক-বিশ্বাসজাত 'জল-দানো'র প্রসঙ্গ রয়েছে। 'জুজুবুড়ি'ও প্রেতাত্মা। প্রেতাত্মা ডাইনির রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়ায়। 'জুজুবুড়ির ভয়' নাটিকায় ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে শোনা যায় :

মা গো, তোরে সত্যি বলি, দেখে এলাম ছাদে গিয়ে,
মা-ধরা এক জুজুবুড়ি বসে আছে ঝুলি নিয়ে।
বললে, যে মা খোকায় ধরে যখন তখন দুধ খাওয়ায়
চুলের মুঠি ধরে তার তিন সের দুধ খাওয়াই তায়।
খবরদার মা, দুধ খেতে আর বলিসনে কো দোর দিয়ে।
(নজরুল, ২০০৮ : ৩৬৪)

'আলেয়া' নাটকে আলেয়া এক ধরনের লোক-বিশ্বাস। রাতের অন্ধকারে পথহারা মানুষকে বিভ্রান্ত করা তার কাজ। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের ভাবনা উপস্থাপন করা যায় :

> ভূগর্ভস্থ এক জাতীয় গ্যাস বাতাসের ঘর্ষণে জ্বলে— দিনের আলোয় তা দেখা যায় না, কিন্তু রাত্রে দেখা যায়। সাধারণ মানুষ একেই 'আলেয়া' বলে জানে। জলাভূমিতে আলেয়ার জন্ম; ভ্রান্ত পথিককে পথ ভুলিয়ে ঘুরানো এর ধর্ম— কবির এরূপ ব্যাখ্যা লোকসম্মত হয়েছে। 'নিশি' আলেয়ার মতো রাত্রিবেলার প্রেতাত্মা— নিশি ঘুমন্ত মানুষকে ডাক দিয়ে বাইরে নিয়ে নানারূপ হয়রানি করে, এমনকি জলাশয়ে নিয়ে হত্যাও করে।(ওয়াকিল, ২০০১ : ৮৬)

নিসর্গের ব্যবহার লোক-উপাদানের পর্যায়ভুক্ত। 'বাসন্তিকা' লোকনাটক। এখানে রয়েছে ফুল, পাখি, ঋতু, দখিনা বাতাস, পঞ্চশর প্রভৃতি প্রসঙ্গ। যেমন :

> পঞ্চশর : শুনিতেছ, কি মধুর গান আসে ভেসে?
> চৈতালি : তোমাদের রাজার বন্দনা গাহিতেছে বনলক্ষ্মী।
> বলিতে কি পার বন্ধু তুমি কি করিছে রাজা-রানি কুঞ্জে নিরালায়?
> দখিন হাওয়া : আমি যদি চলে যাই এই স্থান ত্যাজি যা করিবে নিরালাতে তোমরা দু'জন-তেমনই একটা কিছু। বেশি কিছু নহে।
> (নজরুল, ২০০৮ : ৩৫৯)

নজরুলের নাটক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তার অধিকাংশ নাটকই নাট্যরস নিষ্পত্তিতে প্রত্যাশিত মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়নি। তাঁর নাটকে নেই কোনো উজ্জ্বল চরিত্র কিংবা সুবিন্যস্ত কাহিনি।

নেই নাটকের পক্ষে অপরিহার্য উপাদান গতিবেগের পুরোমাত্রায় উপস্থিতি। ফলে সাধারণ অর্থে নাটক বলতে যা বোঝায় নজরুলের নাটক তা নয়। তা সত্ত্বেও বাংলা নাট্যসাহিত্যে তিনি একটি বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন– তা হলো গীতিনাট্যকার হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ।

নজরুল-প্রতিভার মূল শক্তি তাঁর কবি-সত্তা। তাঁর গদ্য রচনায়ও রয়েছে কবি-সত্তার স্পর্শ ও লাবণ্য। ফলে তাঁর নাটকের গদ্য সংলাপ, চরিত্রসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতিতে রয়েছে কাব্যের স্পর্শ। একইভাবে তিনি গণমানুষের কবি। জন ও জনতার কথা তাঁর সাহিত্যের মর্মমূলে বিরাজমান। নাট্যসাহিত্যও এ থেকে ব্যতিক্রম নয়। এই বিদ্রোহী সত্তার পাশাপাশি তাঁর আরেকটি পরিচয় হলো সহজ-স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি লোক-ঐতিহ্যের চর্চাকারী। নাটকে লোকজ উপাদান, উপকরণ, অনুষঙ্গের বহুমাত্রিক ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর কারণ :

> যুদ্ধে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নজরুল ছিলেন রীতিমত গ্রামীণ জীবনের মানুষ। এক কথায় তাঁর বাল্য-কৈশোর-তারুণ্যের বছরগুলো কাটে গ্রামীণ পরিবেশে। তবে তাঁর এই জীবন ছিল অন্য দশজন গ্রামের মানুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অনেক ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যে ভরপুর। মক্তবের শিক্ষক মসজিদের মোয়াজ্জিন, রেলওয়ে গার্ডের খানসামা, রুটির দোকানের বয়, লেটোদলের গান রচয়িতা ইত্যাদি বিচিত্র ও বহুমুখী জীবন থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ। লোকজীবনের এই মুক্ত পাঠশালায় লোক-ঐতিহ্য ও লোক-সংস্কৃতির নানা উপাদান মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। (সেলিম, ১৯৯৭ : ১৭)

নজরুল লোকায়ত জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে মনের গভীরে ধারণ করে লোকায়ত জীবনের প্রতিচ্ছবিকে তুলে আনতে ছিলেন সতত সচেষ্ট। তাঁর নাটকে লোক-ঐতিহ্যের প্রকাশ সুস্পষ্ট। লোক-ঐতিহ্যের প্রায় প্রতিটি শাখাতে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। নাটকে লোক-বিশ্বাস, লোক-সংস্কার, ছড়া, গান স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

সহায়কপঞ্জি

অনুপম হায়াৎ (১৯৯৭)। *নাট্যকার নজরুল*। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
আরিফুল হক (১৯৯৯)। *নাট্যকার নজরুল ইসলাম*। নজরুল একাডেমি, ঢাকা।
ওয়াকিল আহমদ (২০০১)। *নজরুল লেটো ও লোক-ঐতিহ্য*। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
কাজী নজরুল ইসলাম (২০০৮)। *নজরুল রচনাবলী* (৫ম খণ্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
কাজী নজরুল ইসলাম (২০০৮)। *নজরুল-রচনাবলী* (৬ষ্ঠ খণ্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
কাজী নজরুল ইসলাম (২০০৮)। *নজরুল-রচনাবলী* (৭ম খণ্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
কাজী নজরুল ইসলাম (২০০৮)। *নজরুল-রচনাবলী* (৮ম খণ্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
মাহবুব হাসান (২০০১)। *নজরুলের কবিতায় মিথ ও লোকজ উপাদান*। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
রফিকুল ইসলাম (২০০১)। *নজরুল সাহিত্য*। মৌলী প্রকাশ, ঢাকা।
সেলিম জাহাঙ্গীর (১৯৯৭)। *লোকায়ত নজরুল*। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
সৈয়দা মোতাহেরা বানু (২০০১)। *নজরুলের শিশুসাহিত্য*। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।